শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

শ্রীযুক্ত কেশব সেন (১৮৮১), দেবেন্দ্র ঠাকুর, অচলানন্দ, শিবনাথ, হৃদয়, নরেন্দ্র, গিরিশ

"প্রাণের ভাই শ্রীম, তোমার প্রেরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ খণ্ড, কোজাগর পূর্ণিমার দিন পেয়ে আজ দ্বিতিয়ায় শেষ করেছি। ধন্য তুমি! এত অমৃত দেশময় ছড়ালে! * * যাক, তুমি অনেকদিন হল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তো আর শ্রীম'র মতো কপাল করে আসিনি যে, শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখব। যতদূর মনে আছে লিখে যাই, হয়তো একদিনের কথা আর একদিনের বলে লিখে ফেলব। আর কত ভুলে গেছি।

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন। সেদিন কেশববাবুর আসিবার কথা। আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়া ঘাট থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরমহংস কোথায়?" তিনি উত্তরদিকের বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, "এই পরমহংস।" কালাপেড়ে (Sic) ধুতিপরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে আমি ভাবলাম, 'এ আবার কিরকম পরমহংস?' কিন্তু দেখলাম, দুটি ঠ্যাং উঁচু করে, আবার দুইহাত দিয়ে বেষ্টন করে আধাচিৎ হয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হয়েছে। মনে হল 'এঁর কখনও বাবুদের মতো তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন।' তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডানপাশে একটি বাবু বসে আছেন। শুনলাম তাঁর নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যিনি বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। আরও ডানদিকে কয়েকটি লোক বসে আছেন। একটু পরেই রাজেন্দ্রবাবুকে বললেন, "দেখো দিখিন্ কেশব আসছে কি না?" একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বললেন, "না"। আবার একটু শব্দ হতে বললেন -- "দেখো, আবার দেখো"। এবারও একজন দেখে এসে বললেন -- "না।" অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে -- ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' হাঁ, দেখো কেশবের চিরকালই কি এই রীত! আসে, আসে, আসে না। কিছুকাল পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবলসহ এসে উপস্থিত।

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে ওঁকে প্রণাম করলেন, উনিও ঠিক তদ্রূপ করে একটু পরে মাথা তুললেন। তখন সমাধিস্থ, -- বলছেন -- "রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন -- আমি কি না বক্তৃতা করব। তা আমি পারব টারবনি। করতে হয় তুমি কর। আমি ও-সব পারবনি!"

ওই অবস্থায় একটু দিব্য হাসি হেসে বলছেন -- "আমি তোমার খাব-দাব থাকব, আমি তোমার খাব শোব আর বাহ্যে যাব। আমি ও-সব পারবনি।" কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন, এক-একবার ভাবের ভরে "আঃ আঃ" করছেন।

আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি, "এ কি ঢঙ?" আর তো কখনও এমন দেখি নাই; আর যেরূপ বিশ্বাসী তাতো জানোই।

সমাধিভঙ্গের পরে কেশববাবুকে বললেন, "কেশব, একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুনলাম তুমি বলছো, 'ভক্তি নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়বো।' আমি তখন উপর পানে তাকাই (যেখানে কেশববাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক বসেছিলেন) আর ভাবি, তাহলে এদের দশা হবে কি? তোমরা গৃহী, একেবারে সচ্চিদানন্দ-

সাগরে কি করে গিয়ে পড়বে? সেই নেউলের মতো পেছনে বাঁধা ইট, কোনো কিছু হলে কুলঙ্গায় উঠে বসলো, কিন্তু থাকবে কেমন করে। ইটে টানে আর ধুপ করে নেবে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান-ট্যান করতে পার কিন্তু ওই দারাসুত-ইট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তি নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার উঠবে। এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি করে?"

কেশববাবু বললেন, "গৃহস্থের কি হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?"

পরমহংসদেব "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র" দুই-তিন বার বলে উদ্দেশে কবার প্রণাম করলেন, তারপর বললেন: -- "তা জানো, একজনার বাড়ি দুর্গোৎসব হত, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধুমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মশাই আজকাল যে আপনার বাড়িতে বলির ধুমধাম নাই? সে বললে, আরে! এখন যে দাঁত পড়ে গেছে। দেবেন্দ্রও এখন ধ্যানধারণা করছে, তা করবেই তো। তা কিন্তু খুব মানুষ।

"দেখো, যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ থাকে ডাবের মতো। নারকেল যতদিন ডাব থাকে, তার লেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটুকু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হয়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ওই শাঁস আর মালা পৃথক হয়ে যায়, তখন শাঁসটা ভিতরে ঢপর ঢপর করে। আত্মা হয় আলাদা, আর শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে আর যোগ থাকে না।

"ওই যে 'আমি'টে ওটাতেই বড় মুশকিল বাধায়। শালার 'আমি' কি যাবেই না? এই পোড়ো বাড়িতে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে; খুঁড়ে ফেলে দাও আবার পরদিন দেখো, এক ফেঁকড়ি গজিয়েছে; -- ওই 'আমি'ও অমনি ধারা। পেঁয়াজের বাটি সাতবার ধোও শালার গন্ধ কি কিছুতেই যাবেনি?

কি বলতে বলতে কেশববাবুকে বললেন -- "হাঁ কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে 'ঈশ্বর নাই?' বাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, এক পা ফেলে আর-এক পা ফেলতেই 'উঃ পাশে কি হল' বলে অজ্ঞান। ডাক ডাক ডাক্তার ডাক! -- ডাক্তার আসতে আসতে হয়ে গেছে। অ্যাঁ -- এরা বলেন ঈশ্বর নাই।"

এক কি দেড় ঘণ্টা পরে কীর্তন আরম্ভ হল। তখন যা দেখলাম তা বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না। সকলে নাচতে লাগলেন, কেশবকেও নাচতে দেখলাম, মাঝখানে ঠাকুর আর সবাই তাঁকে ঘিরে নাচছেন। নাচতে নাচতে একেবারে স্থির -- সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে বুঝলাম, 'এ পরমহংস বটে।'

আর-একদিন, বোধ হয় ১৮৮৩ সনে শ্রীরামপুরের কয়েকটি যুবক সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সেদিন তাদের দেখে বললেন -- "এরা এসেছেন কেন?"

আমি -- আপনাকে দেখতে।

ঠাকুর -- আমায় দেখবে কি? এরা বিল্ডিং-টিলডিং দেখুক না?

আমি -- এরা তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে।

ঠাকুর -- তবে এরা বুঝি চকমকির পাথর। ভিতরে আগুন আছে। হাজার বছর জলে ফেলে রাখ, যেমন ঠুকবে

অমনি আগুন বেরুবে। এরা বুঝি সেই জাতীয় জীব। আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?

আমরা এই শেষ কথা শুনে হাসলাম। সেদিন আর কি কি কথা হল ঠিক মনে নাই। তবে 'আমি'র গন্ধ যায় না আর কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের কথাও যেন হয়েছিল।

আর-একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি, বললেন: -- "সেই যে কাক্ খুললে ফস্ ফস্ করে উঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?" আমি বললাম -- লেমনেড? ঠাকুর বললেন -- "আন না?" মনে হয় একটা এনে দিলাম। এ দিন যতদূর মনে পড়ে আর কেউ ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম -- "আপনার কি জাতিভেদ আছে?"

ঠাকুর -- কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি, তবু একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়িওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হল না, আবার একটু পরে একজন -- তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল -- ক্যাচর-ম্যাচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জানো জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেলগাছ, তালগাছ বড় হয়, বালতো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ওই শালাদের মতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম -- "কেশববাবু কেমন লোক?"

ঠাকুর -- ওগো, সে দৈবী মানুষ।

আমি -- আর ত্রৈলোক্যবাবু?

ঠাকুর -- বেশ লোক, বেড়ে গায়।

আমি -- শিবনাথবাবু?

ঠাকুর -- * * বেশ মানুষ, তবে তর্ক করে যে!

আমি -- হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি? বললেন -- "তফাত আর কি? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে আর-একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রঙ পরঙ তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রঙ পরঙ তুলে নিচ্ছে।

"জল আর বরফ -- নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমিতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়!

"সেই একই জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চারপাশে চার গাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে 'জল'। ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে বলবে 'পানি'। আর-একঘাটে 'ওয়াটার'; আর-একঘাটে 'অ্যাকোয়া'; জল তো একই।"

বরিশালে আচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলাতে বললেন: -- "সেই কোতরঙ্গের রামকুমার

তো?" আমি বললাম "আজ্ঞা হাঁ"।

ঠাকুর -- তাকে কেমন লাগল?

আমি -- খুব ভাল লাগল।

ঠাকুর -- আচ্ছা, সে ভাল, না, আমি ভাল?

আমি -- তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত বিদ্বান লোক আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একটু অবাক্ হয়ে চুপ করে রইলেন। এক-আধ মিনিট পরে আমি বললাম: -- "তা তিনি পণ্ডিত হতে পারেন, আপনি মজার লোক। আপনার কাজে মজা খুব।"

এইবার হেসে বললেন, "বেশ বলেছো, ঠিক বলেছো।"

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পঞ্চবটী দেখেছো?" বললাম, আজ্ঞা হাঁ। সেখানে কি কি করতেন তাও কিছু বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁকে পাবো কি করে?"

উত্তর -- ওগো সে তো চুম্বক লোহাকে যেমন টানে, তেমনি আমাদের টানতেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাখা থাকলেই লাগতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে যেমন কাদাটুকু ধুয়ে যায় অমনি টুক করে লেগে যায়!

আমি ঠাকুরের উক্তিগুলি শুনে শুনে লিখছিলাম, বললেন: -- "হ্যাঁ দেখো, সিদ্ধি সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও।" * * এরপর আমায় বললেন, "তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মতো হতে পারবে না -- যে খেয়ে খেয়ে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।

"সংসারে থাকবে তো একখানি আমমোক্তারনামা লিখে দাও -- বকলমা দিয়ে দাও। উনি যা হয় করবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাড়ির ঝির মতো। বাবুর ছেলেপুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে যেন তারই ছেলে; কিন্তু মনে মনে জানছে, 'এ আমার নয়'; যেমন জবাব দিলে -- বস্, আর কোন সম্পর্ক নাই।

"যেমন কাঁঠাল খেতে হলে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমনি ওই তেল মেখে নিও তাহলে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে না।"

এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হচ্ছিল; এখন তক্তপোষের উপরে উঠে লম্বা হয়ে শুলেন। আমায় বললেন, "হাওয়া কর।" আমি হাওয়া করতে থাকলাম। চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, "বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও।" আমি বললাম, "আবার শৌক তো আছে দেখছি।" হেসে বললেন -- "কেন থাকবেনি? ক্যা-নো-থাকবেনি?" আমি বললাম, "তবে থাক্ থাক্, খুব থাক্।" সেদিন কাছে বসে যে সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়।

শেষবার -- যে বারের কথা তুমি তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছ -- সেইবার আমার স্কুলের হেডমাস্টারকে নিয়ে

গেছলাম। তাঁর বি. এ. পাশ করার অব্যবহিত পরে। এইবার এই সেদিন তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।

ওঁকে দেখেই বললেন -- "আবার ইটি পেলে কোথায়। বেড়ে তো।

"ওগো তুমি তো উকিল। উঃ বড় বুদ্ধি! আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার? তোমার বাবা যে সেদিন এসেছিলেন, এখানে তিনদিন ছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁকে কেমন দেখলেন?"

বললেন -- "বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজিটি ছাড়িয়ে দেবেন।"

একটু হাসলেন। আমি বললাম, "আমাদের গোটা কতক কথা শুনান।" বললেন, "হৃদয়কে চেনো?" (হৃদয় মুখোপাধ্যায়)

আমি বললাম, "আপনার ভাগনে তো? আমার সঙ্গে আলাপ নাই।"

ঠাকুর -- হৃদে বলত, 'মামা তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেলো না! ফি বার এক বুলি কেন বলবে?' আমি বলতাম, তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি আমি লক্ষ্যবার ওই এককথা বলব, তোর কিরে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তা বটেই তো।"

কিঞ্চিৎ পরে বসে ওঁ ওঁ করতে করতে গান ধরলেন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

দু-এক পদ গাইতে গাইতে ডুব্ ডুব্ বলতে বলতে ডুব্।

সমাধিভঙ্গ হল, পায়চারি করতে লাগিলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এ-দিক দিয়ে খানিকটা মেঝে ঝেটিয়ে যাচ্ছে, ও-দিক দিয়ে খানিকটা অমনি পড়েছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপা-টেপি করছি আর চুপি চুপি বলছি, 'ধুতিটি পরা হয়েছে ভালো!' একটু পরেই 'দূর শালার ধুতি' বলে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। উত্তরদিক থেকে কার যেন ছাতা ও লাঠি আমাদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন -- "এ ছাতা লাঠি তোমাদের?" আমি বললাম, 'না'। অমনি বললেন, "আমি আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পারি। সেই একটা লোক হাঁউ মাঁউ করে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।"

কিছুকাল পরে ওই ভাবেই খাটের উত্তরপাশে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা -- "ওগো, আমায় কি অসভ্য মনে করছো?"

আমি বললাম, 'না আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

ঠাকুর -- আরে শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা বলে কোনরকমে একটা ধুতি-টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। গিরিশ ঘোষকে চেনো?

আমি -- কোন্ গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর -- হাঁ।

আমি -- দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠাকুর -- ভাল লোক।

আমি -- শুনি মদ খায় নাকি?

ঠাকুর -- খাক না, খাক না কদিন খাবে?

বললেন -- "তুমি নরেন্দ্রকে চেনো?"

আমি -- আজ্ঞা, না।

ঠাকুর -- আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, সে বি-এ পাশ দিয়েছে, বিয়ে করেনি।

আমি -- যে আজ্ঞা, আলাপ করব।

ঠাকুর -- আজ রাম দত্তের বাড়ি কীর্তন হবে সেইখানে দেখা হবে। সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও।

আমি -- যে আজ্ঞা।

ঠাকুর -- যাবে তো? যেও কিন্তু।

আমিই -- আপনার হুকুম হল, তা মানব না? অবশ্য যাব।

ঘরে ছবি কখানা দেখালেন, পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায়?"

আমি -- শুনতে পাই, পাওয়া যায়।

ঠাকুর -- সেই ছবি একখানি তুমি আমায় দিও।

আমি -- যে আজ্ঞা, যখন এবার আসব, নিয়ে আসব।

আর দেখা হল না! আর সেই শ্রীচরণপ্রান্তে বসতে ভাগ্যে ঘটে নাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাড়ি গেলাম। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। ঠাকুর একটি কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, নরেন্দ্র তাঁর ডানপাশে আমি সম্মুখে। নরেন্দ্রকে আমার সহিত আলাপ করতে বললেন।

নরেন্দ্র বললেন, আজ আমার বড় মাথা ধরেছে। কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি বললাম, "থাক, আর একদিন আলাপ হবে।"

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সনের মে কি জুন মাসে, আলমোড়ায়।

ঠাকুরের ইচ্ছা তো পূর্ণ হতেই হবে, তাই বার বছর পরে পূর্ণ হল। আহা সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় কটা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম। কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও আমার বাড়িতে, আর-একদিন নির্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে। আর তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সে বারের দেখা।

ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার-পাঁচদিনের দেখা, কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মতো কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত, 'ওরে বাপ্‌রে কার কাছে গেছলাম।' ওই কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে -- এই ভেবে "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।ধ্বঞ্চ আমারই যদি এই, এখন বোঝ তুমি কেমন ভাগ্যধর।"